একটি পরাভবের বৃত্তান্ত

শম্পা চৌধুরী

হাজার চুরাশির মা একটি পরাভবের বৃত্তান্ত

মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে সামান্য পড়াশোনার সূত্রে হঠাৎ একটি লেখা হাতে এল। লেখাটির শিরোনাম, 'Art as Protest: Social Commitment in the Novels of Mahasweta Devi', লেখক ঊর্মিলা চক্রবর্তী। লেখাটির একেবারে গোড়াতেই ঊর্মিলা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৯৮-এর সেই আলোচনা চক্রে উপস্থিত মহাশ্বেতা তাঁর বক্তৃতার প্রথমেই বলেছিলেন যে সেই বিদগ্ধ অভিজাত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বক্তৃতা দেওয়ার মতো যথেষ্ট শিক্ষিত বা অনর্গল ইংরেজি ভাষণে অভ্যস্ত কোনোটাই তিনি নন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত, ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত, কলেজের অধ্যাপিকার এহেন বক্তব্যে ঈষৎ বিচলিত হলেও লেখক সহজেই বুঝেছিলেন যে তা ছিল মহাশ্বেতার একান্ত ব্যক্তিগত ধরনের প্রতিবাদ। যে প্রান্তিক জনজীবন তথা চিরবঞ্চিত অবহেলিত মানুষজন তাঁর লেখার বিষয় তাদের সঙ্গে এই তথাকথিত নাগরিক, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রকৃত অর্থে কোনও যোগাযোগই নেই।

আলোচনার শুতেই এই কথাগুলো বলার প্রয়োজন এইখানেই যে মহাশ্বেতার সারস্বত জগতের আলোচনায় কোনও পূর্বনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর ব্যবহার আমার কাছে অন্তত অর্থহীন। বস্তুত মহাশ্বেতার মূল ধারার লেখার যারা কুশীলব, আমাদের কাছে তারা নিতান্তই অপরিচিত, তাদের সমাজ বাস্তবতা একটি সুদূর ধূসর, অচেনাশব্দজগৎ মাত্র। এ জগতকে বা এ জগতের মানুষজনকে বুঝতে হলে আমাদের চেনা জগতের পরিধিটাকে বাড়াতে হবে; শুধু বই পড়েনয়, জীবনে জীবন যোগ করে। ১৩৮৫-তে প্রকাশিত 'অগ্নিগর্ভ' বইটির ভূমিকায় মহাশ্বেতা নিজেইলিখেছেন, 'আমি বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদলে আকাঙ্ক্ষিত, নিছক দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।'

মহাশ্বেতার এই উক্তির আলোকে তাঁর যে উপন্যাসটিকে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিচ্ছি তার নাম 'হাজার চুরাশির মা'।---- বহুল পঠিত। অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস হলেও একথা মানতেই হবে যে মহাশ্বেতার একান্তনিজস্ব সাহিত্য - ভুবনের সঙ্গে এর সরাসরি কোনও যোগ নেই--- এর জগৎ আমাদের একান্ত পরিচিত মধ্যবিত্তের জগৎ --- একজন মধ্যবিত্ত মায়ের চোখ দিয়ে দেখা সত্তরের সেই রক্তস্নাত, আত্মবিধ্বংসী কয়েকটি বছর। কিন্তু কেন লিখলেন মহাশ্বেতা এমন বই? মাতৃহৃদয়ের বেদনা নিয়ে বৃহত্তর পাঠকহৃদয়ে প্রবেশের রাস্তাটি সুগম বলে? শুধুই সময়ের দলিল তৈরির সদিচ্ছায়? না কি আরও গূঢ় কারণ ছিল কোনও, আরও গভীরতর কোনও অভিপ্রায়? ১৩৮৩-র'দেশ সাহিত্য সংখ্যা'য় 'আমি/আমার লেখা' শীর্ষক গদ্য নিবন্ধমহাশ্বেতা নিজেই লিখেছেন, 'সত্তরের দশকে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মানসিক নির্বীর্যতা ও অন্ধকার অবক্ষয়ের চূড়ান্ত চেহারা দেখলাম। দেশ ও মানুষ যেখানে প্রত্যহ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় দীর্ণ বিদীর্ণ হচ্ছিল, পরীর দেশের অলীক, স্বপ্নাশ্রয়ী বাগানে মিথ্যে ফুল ফোটাবার ব্যর্থ,আত্মঘাতী খেলায় ব্যস্তহয়ে গেল। কেন এমন হল, তার বিশ্লেষণ করল

না কেউ। সামগ্রিকভাবে, খুব কম লেখাই সময়ের দলিল হয়ে রইল। আমরা ভুলে গেলাম, আমরা বাঁচি সন্তানদের, উত্তর পুষের মধ্যে। এই সততা ও সাহসিকতার অভাব কি উত্তর পুষ ক্ষমা করবে? বিজ্ঞান-উপন্যাসের জগতে যা ঘটে তাই যদি হয়? অনাগত ভবিষ্যত থেকে পিছু হেঁটে বর্তমানে এসে যদি আমাদের উত্তর পুষ আমাদের দায়ী করে, অভিযুক্ত করে, আমরা কী বলব?ভয় পেয়েছিলাম? আপাত নিরাপত্তা বড় বেশি প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল? সব সময় আমার মনে হয়, কেন মনে সেই অভিযোক্তার কড়া নাড়ার শব্দ আমার দরজায় শুনতে পাচ্ছি? হ্যাঁ, আমি ব্যথিত ক্রুদ্ধ, দীর্ণ, যন্ত্রণার্ত, প্রাকুল থাকি। এবং ব্রতীতে ভুলে যাব ভাবলে সুজাতার মতোই আমি ভয় পাই। আমার জীবনকালে আমি এ যন্ত্রণা থেকে উত্তরণচাই না। কেননা, আমার পক্ষে বিস্মরণ মানে মৃত্যু। সেদিন আমার মৃত্যু ঘটবে। শুধু শরীর বাঁচলে কি আমি বাঁচব?'

আজ মহাশ্বেতার এই কথাগুলো পড়ার সময় স্বাভাবিক অনিবার্যতায় মনে পড়ে যায় প্রায় দুদশক পরে তাঁরই আত্মজ সাহিত্যিক নবাণ ভট্টাচার্য-র লেখা 'পেট্রল দিয়ে আগুন নেভাবার স্বপ্ন' শীর্ষক গদ্য রচনাটির সেই লাইনগুলি সেখানে তিনি লিখছেন, '.....সত্তরের বিপ্লবী রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্পর্শকের। মূলত কবি ও গদ্যলেখক হিসেবেই।...আমার দ্বারা সম্ভব অর্থবহ কাজ লেখা। তাই লেখার মধ্য দিয়েই আমার যৌবনের প্রজন্মের তৈরি করা ইতিহাসে সাড়া না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। আজ আমি সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। সেই নদীর স্রোত বা পৃথিবী কোনও কিছুই সেখানে থেমে থাকেনি। কিন্তু এখনও আমি অনুভব করি কোথাও একটা সত্য থেকে গেছে। গভীরে, রহস্যে, রহস্যময় মুদ্রায়, অভিক্ষেপে, বোঝায় ও বোঝা গ্রহণ করায়, বোধে, নির্বোধে, কোমায়, অতিক্রমায়, ভয়ে, অভয়ে --- মিটমিটে নববই-এর শেষে কোকাকোলা সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের মধ্যে এক অর্থে সত্তরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সর্বস্পর্শী। আমার সঙ্গে সঙ্গে সত্তর থাকবে। চেতনা থেকে সত্তর যদি অন্তর্হিত হয়তাহলে আত্মপরিচয় বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

'হাজার চুরাশির মা' এক সৎ, সময়ের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কথাসাহিত্যিকের বিবেকের দায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে মধ্যবিত্ত জনমানসে যে হতাশা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শু করেছিল তার চরম বিস্ফোরণ ঘটল নকশালবাড়ি আন্দোলনে। কিন্তু যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এই আন্দোলন আরম্ভ হল তা শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত পরিণতি পেল না। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান জানানো হলেও ব্যক্তিহত্যার পন্থা, কৃষিজীবীদের মধ্যে আন্দোলনে ভিত পোক্ত না হওয়া, আন্দোলনের মধ্যে সমাজবিরোধীদের অবাধ প্রবেশ প্রভৃতি কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নকশালপন্থী আন্দোলন জনসমর্থন হারাল। একই সঙ্গে মূলত শহরকেন্দ্রিক সাংগঠনিকতার ফলে রাষ্ট্রের পক্ষেও সহজেই তাকে শনাক্ত করে দমন করা সম্ভবপর হল। ১৯৭২ -এর মধ্যে এই আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এল। পুলিশ, মিলিটারি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নে প্রাণ হারাল অগণিত প্রতিশ্রুতিময় যুবক। V.S.Naipaul এর ভাষায়.... the movement's stated aim had stirred the best young men in India. The best left the universities and went far away, to fight for the landless and the oppressed and for justice. They went to a battle they knew little about. They knew the solutions better they knew the problems, better than they knew the country... Naxalism was an intellectual tragedy, a tragedy of idealism...' বস্তুত হত্যা, প্রতিহত্যা, অগণতান্ত্রিক দমননীতি প্রভৃতির যোগফলে অপমৃত্যু ঘটল এক রাজনৈতিক আদর্শবাদের, যে আদর্শবাদ বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে এখনও পর্যন্ত ফিরে এল না।

নকশাল আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে এল, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাহায্যে যখন তাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হল তখন স্বাভাবিকভাবেই সচেতন জনমানসে দেখা দিল কিছু সংগত প্রশ্ন। সে প্রশ্ন কখনও বিপ্লবের পদ্ধতি ও নেতৃত্ব নিয়ে, কখনও ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে, কখনও বা সেই যুবসমাজের মানসিকতাকে ঘিরে যারা একটা আদর্শে প্রবলভাবে বিশ্বাসী আবার একই সঙ্গে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি যাদের তীব্র অনাস্থা। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে এই প্রশ্নগুলোই ফিরে এসেছে এক সন্তানহারা মায়ের আবেগে আপ্লুত হয়ে। সুজাতার ছেলে ব্রতী যে তার উচ্চবিত্ত পরিবার, এমনকী মায়েরও অজান্তে যোগ দেয় নকশাল আন্দোলনে তারই মর্মান্তিক পরিণতির সামনে দাঁড়িয়ে সুজাতার মনে হয়, 'ব্রতীর মৃত্যুর আগের প্রশ্ন হল কেন ব্রতী বিশ্বাসহীনতার ব্রতকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করেছিল।' প্রৌঢ়া সুজাতা ব্রতীর মৃত্যুর পর তাকে বোঝার চেষ্টায় তার নিম্নবিত্ত বন্ধুদের পরিবারের সংস্পর্শেআসেন, তাঁরই মতো যারা হারিয়েছে তাদের সন্তানকে। একই সূত্রে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ব্রতীর বান্ধবী নন্দিনীর সঙ্গে, জীবিত থাকলেও পুলিশি অত্যাচারের ফলে যে অনেকাংশে বিকলাঙ্গ।

সমাজের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সংযোগ ঘটার ফলে সুজাতার চেতনায় ধরা পড়ে, স্বার্থান্ধ সমাজব্যবস্থা ও প্রশাসনের যথার্থ স্বরূপ--- 'এ সমাজে বড় বড় হত্যাকারী, যারা খাবারে - ওষুধে-শিশুখাদ্যে ভেজাল মেশায় তারা বেঁচে থাকতে পারে। এ সমাজে নেতারা গ্রামের জনগণকে পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দিয়ে বাড়ি গাড়ি পুলিশ পাহারায় নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু ব্রতীতাদের চেয়ে বড় অপরাধী। কেননা সে এই মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও স্বার্থান্ধ নেতাদের সমাজে বিশ্বাস হারিয়েছিল। এই বিশ্বাসহীনতা যে বালক, কিশোর বা যুবকের মনে ঢুকে যায়, তার বয়স বারো - ষোলো- বাইশ যাই হোক, তার শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু। তার এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু। সবাই তাদের হত্যা করতে পারে। সব দল ও মতের লোকেদের এই দলছাড়া তণদের হত্যা করবার নির্বাধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। আইন - অনুমতি-বিচার লাগেনা।' অপূরণীয় ব্যক্তিগত ক্ষতি ওশ্বাসরোধকারী শোকের সামনে দাঁড়িয়ে সুজাতা অনুভব করেন এই সমাজব্যবস্থা, এই দলীয় রাজনীতি যুবমানসের বিদ্রোহের প্রতি কতদূর নির্বিকার, নিস্পৃহ ও হৃদয়হীন। যেদিন ব্রতী মারা যায় সেদিনও '...বাজারে সোনার দর চড়েছিল, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বহন করে ভারতীয় হাতির বাচ্ছা দমদম থেকে টোকিওতে উড়ে গিয়েছিল, কলকাতায় বিদেশী ছবির উৎসব হয়েছিল, সচেতন শহর কলকাতার সচেতন ও সংগ্রামী শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা ভিয়েৎনামে বর্বরতার প্রতিবাদে আমেরিকান কনসুলেটের মেন রোড়ে, সুরেন ব্যানার্জি রোডের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন।' এর ঠিক একবছর তিনমাস বাদে কলকাতার লেখক-শিল্পী - বুদ্ধিজীবীরা যখন বাংলাদেশের সহায় ও সমর্থনকল্পে পশ্চিমবঙ্গে তোল পাড়া করে ফেলেছিলেন সুজাতার মনে হয় হয়তো তিনিই ভুল করছেন। সত্যিই যদি কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে সেদিন নৃশংস অত্যাচার ও দমন হয়ে থাকতো, '... তাহলে তো কলকাতার কবি ও লেখক ওপারের পৈশাচিকতার সঙ্গেএপারের পৈশাচিকতার কথাও বলতেন? যখন তা বলেননি, যখন কলকাতার প্রত্যহের রক্তোৎসবকে উপেক্ষা করে কবি ও লেখক শুধু ওপারের মরণযজ্ঞের কথাই বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিই নির্ভুল? সুজাতার দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয় ভুল? নিশ্চয়।' সুজাতার এই মর্মবিদারক হাহাকার আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন তিনি উপলব্ধি করেনসেই অস্বাভাবিক সময়ে দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিজ্ঞ, প্রশাসক এবং বুদ্ধিজীবীরা সকলেই অভিনয় করে গেছেন এক 'অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার'। এই স্বাভাবিকতা যে কী ভয়ঙ্কর, কী পাশব, কী হিংস্র তা সুজাতা মর্মে মর্মে জানেন।'ব্রতীরা জেলে মরছে, পথে মরছে, কালো ভ্যানের তাড়া খাচ্ছে, উন্মত্ত জনতার হাতে মরছে, সমস্ত জাতির যারা বিবেক স্বরূপ, তারা কেউ ব্রতীদের কথা বলছে না। সবাই এই একটি ব্যাপারে চুপ করে আছে।' বস্তুত পক্ষে এভাবেই এক মৌনসম্মতির চক্রান্তে ক্রমশ ধবংস হয়ে গেল একটা গোটা প্রজন্ম, যাদের পন্থায় ভুল থাকতে পারের কিন্তু যাদের আদর্শবাদে কোনও খাদ ছিল না। আর এই সত্য বোঝার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলেন সুজাতা নিজেও। স্বামী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু ও জামাতা পরিবৃতা এক প্রৌঢ়া সচেতনভাবে অস্বীকার করলেন পারিবারিক মূল্যবোধকে। ব্রতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেন অন্যদের থেকে, সিদ্ধান্ত নিলেন 'যেখানে ব্রতী নেই সেখানে থাকবেননা।' বলাবাহুল্য এখান থেকেই শু হয় 'হাজার চুরাশির মা'-র এক নতুন পাঠের সম্ভাবনা। চিরাচরিত মাতৃ প্রতিমার নিয়ত ভাঙাগড়ার এক অনিঃশেষ সাহিত্যিক দোটানা।

জীবনে মানুষ প্রথম যে সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে তা হল বাৎসল্য প্রতিবাৎসল্যের সম্পর্ক। মা ও সন্তানের সম্পর্ক পৃথিবীর নিবিড়তম সম্পর্ক। জন্মের আগে থেকেই মায়ের সঙ্গে শারীরিক একাত্মতার সূত্রে সন্তানের যে সম্পর্কের সূচনা হয় তারই জের চলে সারা জীবন ধরে। জের চলে শুধু সন্তানের দিক থেকেই নয়, মায়ের দিক থেকেও অর্থাৎ উভয়ত। যুগ বদলায়, চি বদলায়, বদলায় জীবনচর্চার ধরন তবু কোথাও থেকে যায় এক অদৃশ্য বন্ধন, রক্তে লীন সংগোপন এক অব্যক্ত অনুভব। আর হয়তো এইজন্যই নববই -এর মাঝামাঝি প্রায় সত্তরে পৌঁছে যাওয়া মহাশ্বেতা যখন 'প্রমা'-য় অনিয়মিতভাবে 'এক জীবনেই' শীর্ষক আত্মজৈবনিক লেখাটি লিখতে আরম্ভ করেন তখন খুব স্বাভাবিকভাবে প্রথমেই এসে যায় তাঁর নিজের মায়ের কথা--- 'লিখতে বসে মায়ের কথাই মনে হয়বেশি। আমি বড়ই মাতৃভক্ত সন্তান। এখনও দিনে একবার তাঁকে মনে মনে ডাকি। ঝগড়াও করি। তোমার সাতাত্তর বছর বয়স হয়েছিল, রোগে শোকে ঝলসে গিয়েছিল, সবই সত্যি। কিন্তু আমি তো তোমাকে আটান্ন বছর ধরেই পেয়েছি। আমি কী করি?' একদিকে যেমন 'মা' অন্যদিকে তেমনি তাঁর স্মৃতিচারণায় একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে তাঁর একমাত্র সন্তান 'বাপ্পা'। মহাশ্বেতা নিজেই লিখেছেন, 'বাপ্পার বড় হওয়ার ওই পর্বে কাছে থাকা খুব বড় প্রাপ্তি। ওর চোখ দিয়ে কত কী দেখতাম। কত, কতরকম গল্প না বলতাম। 'হাজার চুরা

শির মা' বইয়ে ব্রতীর শৈশব, ব্রতীর বর্ণনা, ব্রতীর কবিতা পাঠ, সব কিছুতেই বাপ্পা স্বাধিকারে ঢুকে বসে থাকে। তেমনই হবার কথা ছিল।' কিন্তু কেবল এই একটি উপন্যাসে নয়, সামগ্রিকভাবে মহাশ্বেতার সাহিত্য কর্মেরই একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে 'বাপ্পা'-- অবশ্যই অন্য নামে, অন্য পরিচয়ে, সহজ সাদৃশ্যের সমস্ত সম্ভাবনা এগিয়ে। স্বয়ং মহাশ্বেতাই স্বীকার করেছেন, '১৯৯৬-র পর থেকে আজ অবধি বাপ্পা কোথায়, কত লেখায় আছে, থাকে, ঘুরে ঘুরে আসে তা ও জানে না। লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়লেই বুঝবে। মা ও ছেলে। মা ও মেয়ে, কত বইয়ে কতবার।'

১৯৪৭-এ শারদীয়া 'প্রসাদ'-এ প্রকাশিত 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসটি আগাগোড়াই এক মায়ের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে লেখা। সর্বজ্ঞ কথকের বিবরণে উপস্থাপিত হলেও টানটান আবেগের তীব্রতার কথক ও উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যবর্তী ভেদরেখা বারেবারেই মুছে যায়; বর্ণনা অংশ বাদ দিয়ে গোটা উপন্যাসটাই প্রায় হয়ে ওঠে সুজাতার আত্মকথন, সন্তানহারা মায়ের যন্ত্রণাদীর্ণ আত্মমোচনের এক রক্তাক্ত দলিল। উপন্যাসটির ঘটনাকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত -- মাত্র একটি দিন --- সকাল থেকে রাত। কিন্তু সুজাতার স্মৃতিচারণার সূত্র ধরে এই নিতান্ত সীমাবদ্ধ কালখণ্ড বিস্তার লাভ করে এক বৃহৎ সময়ের পরিসরে --- ব্রতীর জন্মেরও আগে থেকে ব্রতীর মৃত্যুর পর দু'বছর পর্যন্ত অনধিকবাইশ বছরের সময়ের হিসাবে। ব্রতী নিহত হওয়ার ঠিক একবছর পর ব্রতীর মৃত্যুদিনে যা আবার তার জন্মদিনও বটে, ব্রতীর কথা ভাবতে ভাবতে সুজাতা পৌঁছে যায় অন্য এক বোধে। ব্রতীদের বুঝতে চেয়ে তিনি ক্রমশ চিনেনেন তাঁর চারপাশে সুখী, স্বার্থান্ধ সমাজব্যবস্থাকে যেখানে ব্রতীদের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার ছিল না ; উপলব্ধি করেন সম্মিলিত নীরবতার সেই পাশবিক চক্রান্তকে, যার নিশ্চেষ্ট নিস্পৃহতায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল একটা গোটা প্রজন্ম। আর এ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার নিজেকে নতুন করে চেনার একটা প্রক্রিয়াও আরম্ভ হয়ে যায়। ভিতরে, বাইরে ক্রমাগত ঘা খেতে খেতে দীর্ণ, রক্তাক্ত আত্মআবিষ্কারের এই অধ্যায়টি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে, কারণ সুজাতা তো শুধু ব্রতীর মা নন, তিনি নীপা, জ্যোতি, তুলিরও মা। চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দিব্যনাথ চ্যাটার্জির স্ত্রী, এক অভিজাত পরিবারের গৃহিনী, প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্না শাশুড়ীরশ্বাসরোধী ব্যক্তিত্বের আড়ালে প্রায় নীরব, হৃতবাক এক পুত্রবধু, সব অর্থেই মধ্যবিত্ত এক রমণী। এখানেই সুজাতা আলাদা হয়ে যান 'স্তনদায়িনী'-র যশোদা, 'বাঁয়েন'-এর চণ্ডী কিংবা 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পের জটি ঠাকরুণের থেকে। 'স্তনদায়িনী' গল্পে মাতৃত্বের প্রচলিত রূপকল্পটি ভেঙে মহাশ্বেতা গড়ে তোলেন এক নতুন মিথ। মাতৃত্বের চিরাভ্যস্ত প্রতিমাটি ক্রমশ পরিণত হয় জীবিকা নির্বাহী যন্ত্রে। যশোদার যে স্তনযুগলে মুখ গুঁজে তার স্বামী কাঙালী মনে গোপালভাব এনে স্বস্তি পায় সেই স্তনই আবার খাদ্য জোগায় শুধু যশোদার নিজের সন্তানদের নয় হালদার বাড়ির বংশধরদেরও, যাদের মোট সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। মাতৃত্বের প্রধানতম অঙ্গটি পর্যবসিত হয় অর্থোপার্জনের যন্ত্রে; সেই যন্ত্রে দুধের জোগান অব্যাহত রাখতে যশোদাকে মোট কুড়িবার সন্তান ধারণ করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্তনের ক্যান্সারে তার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগে ব্রেন কোমাটেজ -এ আক্রান্ত যশোদা বিশ্বসংসারের সকলকেই দুধছেলে ভাবতে থাকে ---'যে ডাক্তার দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে ডোম, সবাই তার দুধছেলে--- সবাই দুধছেলে কিন্তু কেউ তার নয়।' গল্পের শেষে মহাশ্বেতা লেখেন, 'বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না।' ভেঙে যায় যশোদার পুরাণ প্রতিমা, গড়ে ওঠে মাতৃত্বের এক নতুনতর সংজ্ঞা যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক চাহিদা ও জোগানের প্রশ্ন। 'বাঁয়েন' -এর চণ্ডীও যশোদার মতো একলা হয়ে যায়। 'বাঁয়েন' ধরার পর গাঁয়ে তার আর জায়গা হয় না, জায়গা হয় না পরিবারে--- গ্রাম্য সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয় মাতৃত্বকে। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ যাকেএকদিন বিসর্জন দেয় সে-ই আরেকদিন জীবনের বিনিময়ে রক্ষাকরে সরকারি তহবিল। মৃত্যুর পর রেলকোম্পানি যখন তাকে মেডেল দেয় তখন হঠাৎই ডোমেদের সমাজ তাকে আবার স্বীকার করে নেয়, পরিচয় দেয় জ্ঞাতি বলে। চণ্ডী ঘটনাচক্রে বাঁয়েন হয়ে যায় কিন্তু সাধন কান্দোরীর মা জারা ব্যাধ বংশের মেয়ে জটি স্বামী হারিয়ে বুভুক্ষু পুরষের কাছ থেকে বাঁচার জন্য, কোলের সন্তানের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য নিজেই বেছে নেয় ধর্ম ও সংস্কারের আশ্রয়, হয়ে ওঠে জটি ঠাকুরণ। সাধনের জন্য সে কেবল সাঁঝ সকালের মা, বাকি সময় জটি ঠাকুরণ। তিনটি গল্পেই মাতৃত্বের চেনা ইমেজটির মৃত্যু ঘটিয়ে কথক আভাসিত করেন এক নতুন মিথের সম্ভাবনা আর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে সন্তানের মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আরম্ভ হয় সুজাতার আত্মআবিষ্কার। স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক পারিবারিক পরিচয়ের এক বিষম দ্বৈরথ যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এক চূড়ান্ত বিস্ফে

ারণে।

যশোদা, চণ্ডী বা জটি প্রত্যেকেই কোনও না কোনোভাবে সন্তানের জন্য আত্মবলি দিয়ে মহৎ হয়ে যায় অন্য দিকে সন্তানের মৃত্যু থেকেই আরম্ভ হয় সুজাতার নতুন জীবন। সন্তান তাঁকে দিয়ে যায় এক নতুন দৃষ্টি, নতুন জীবনদর্শন। সমস্ত সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের প্রসাধন ঘুচিয়ে যা ক্রমশ জাগিয়ে তোলে এক আঁকাড়া কাঠামো। কিন্তু যে ব্রতী সুজাতাকে বদলে দেয়, বদলে দেয় নিজেকে দেখবার চোখ, তার জন্মসম্ভাবনা আদৌ অভিপ্রেত ছিল না সুজাতার কাছে দিব্যনাথের সঙ্গে তিক্ত দাম্পত্যের কারণে '...অশ্লীল, অশুচি লেগেছিল নিজেকে ন মাস ধরে'। কিন্তু অনাগত সন্তানের জীবনসংশয়ের আশঙ্কা বদলে দিয়েছিল সব। সেই শু।। এতদিন স্বামী ও শাশুড়ীর প্রবল প্রতাপে সুজাতা ছিলেন অকিঞ্চিৎকর, অস্তিত্বহীন। শাশুড়ি ছিলেন স্নেহান্ধ মা, দিব্যনাথের মেয়েঘটিত যাবতীয় দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন সন্তানের পুষত্বের গৌরবে আর সুজাতার সন্তানদের দখল করেছিলেন এক তীব্র অধিকার বোধে। ব্রতীর জন্মের আগে সুজাতাও এতে আপত্তি করেননি, বুঝেছিলেন 'এ সংসারে তিনি নিজেকে যত নেপথ্যে রাখবেন, তাতেই অন্যের সুখ।' মেনে নিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে শ াশুড়ি ও স্বামীর বানিয়ে তোলা ইমেজ। কেবল ব্রতীর বেলাতেই তিনি বদলে যান। 'ব্রতীর বেলায় সুজাতা তাঁর দখল ছ াড়েননি', ব্রতী একলা শুতে ভয় পায় বলে বিরোধিতা করেছেন দিব্যনাথের নির্দেশের। সংসারে সকলের অনুগত, অনুগ ামী, নীরব, অস্তিত্বহীন সুজাতা ব্রতীকে ঘিরেই গড়তে চেয়েছিলেন নিজস্ব একটি জগৎ, চেয়েছিলেন শাশুড়ি, স্বামী ও অন্য সন্তানদের জীবনচর্চার বিকল্প একটি জীবন -- 'ওর সঙ্গে বই পড়ে, ওকে নিয়ে চিড়ি য়াখানায় বেরিয়ে, ওর বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে গল্পগুজব করে সুজাতা ক্রমেই ওর মধ্যে ডুবে যেতে থাকলেন। ব্রতীই যেন ওর বেঁচে থাকার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্য াখ্যা হয়ে দাঁড়াল।' এরই মাঝে কখন যেন মা ও ছেলের সম্পর্ক বদলে গেল পিতা পুত্রীর সম্পর্কে --- ব্রতী যেন নির্ভরযে াগ্য, শক্তিশালী এক অভিভাবক আর তিনি অসহায় শিশুসন্তান। ব্রতীর মৃতুবার্ষিকীতে স্মৃতিভারাতুর মায়ের সামনে যে টুকরো টুকরো ছবি ভেসে চলে তার কোনোটিতে কখনও তিন বছরের ছোট্ট ব্রতী তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে, 'মা তুমি আজ, শুধু আজ আপিসে যেও না, আমার কাছে থাক।' কখনও সাত বছরের ব্রতী জানালায় বসে কবিতা পড়ে, 'ভয়কাতুরে ছিল যে সবচেয়ে/ সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি'। কখনও বা স্বাধীনতা দিবসে পাড়ার বালক সঙেঘর ছেলেদের সঙ্গে গর্বভরে ড্রাম আর বিউগাল বাজিয়ে মার্চ করে চলে যায়। ক্লাস টেন-এর ব্রতী 'তোমার প্রিয় মানুষ' রচনা লিখতে লিখে আসে 'আমার মা'। আবার এই ব্রতীই মাত্র দশ বছর বয়েসেই মা-র অসুখ করলে খেলা ছেড়ে চলে আসে, জিজ্ঞাসা করে 'তোমার মাথায় বাতাস করব?' মাকে শোনায় 'বীরপুষ' -এর মতো কবিতা, মায়েৰ নীরব কান্নায় ব্যথিত হয়ে বলে 'আমি তোমাকে একটা বাঘ আর শিকার ছাপা শাড়ি কিনে দেব'। কিন্তু এই সমস্ত ছবিই ব্রতীর শৈশব বা প্রথম কৈশোরের। ব্রতী সাবালকত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা ক্রমশ বদলে যেতে থাকে। একদিকে সুজাতা ভাবেন ব্রতী মানুষ হে াক, পড়া শেষ কক, তারপর ব্রতীকে নিয়ে চলে যাবেন আর একই সঙ্গে অন্যদিকে মায়ের প্রতি অগাধ ভালবাসা তথা মমত া রেখেও নিজস্ব বোধ ও বিশ্বাসে ব্রতী ক্রমশই দূরে সরে যায়। সুজাতা বোঝেন 'ব্রতী ওঁর অজানা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে, অচেনা', ভয় পান, দুঃখও --- কিন্তু ঘটনার প্রকৃত গুত্ব বোঝার চেষ্টা করেন না। আসলে সুজাতার অস্তিত্ব তখনও পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বৃহত্তর সমাজ - বাস্তব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও নিষ্পৃহ।

ব্রতীর মৃত্যুর পর তাকে বোঝার তাগিদে সুজাতা ক্রমশ উপলব্ধি করেন সমস্ত স্নেহ মমতা আকুলতা সত্ত্বেও ব্রতী যে অ াদর্শে, যে রাজনৈতিক - মানবিক বোধে দীক্ষিত হয়েছিল তার সন্ধান তিনি রাখেননি। তার জীবৎকালে জানার চেষ্টা করেননি বৃহত্তর সেই সমাজকে, সেই মানুষজনকে, যাদের জীবনে জীবনে মেলানোই ছিল ব্রতীর অন্যতম ব্রত। অচেনা ব্রতীকে খুঁজতে খুঁজতে সুজাতা এসে পৌঁছন ব্রতীর সতীর্থ ও মরণসঙ্গী সমুদ্রের বাড়িতে। তাদের জীর্ণ, পিসবোর্ডের তালিম ারা, শ্যাওলা ধরা খোলার চালের ঘরে পুত্রশোকাতুর সমুর মায়ের কাছে এসে তাঁর মনে হয় যেন নিজের জায়গায় এসেছেন। সমুর মায়ের চোখ দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন অন্য এক ব্রতীকে যে পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত--- ব্রতী, তাঁর রক্তের রক্ত, যাকে জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছিল, যে তাঁর কাছে ক্রমশ অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল, অচেনা, তার সঙ্গে সুজাতার যে নতুন করে পরিচয় শু হয় সেই মুহূর্ত থেকে। আর এই পরিচয়ের সূত্রেই তিনি দেখতে পান আরো অনেক অনেক মায়ের অসংখ্য ছেলেকে। লালটু, পার্থ, বিজিত, সমু এবং আরো অনেক, ব্রতীর সঙ্গে বিস্তর সামাজিক ব্যবধ ান সত্ত্বেও সমুর মায়ের ভাষায় যারা ছিল 'একোরকম'। এই ছেলেরা সুজাতার অচেনা যে ব্রতী তাকেই চিনত। তাই ওরা

এবং ব্রতী জীবনে একাত্ম ছিল, মৃত্যুতেও।' এই আবিষ্কার মা হিসেবে সুজাতার ব্যর্থতাকে যেমন চিনিয়ে দেয় অন্য দিকে তেমনি তাঁকে মুক্তি দেয় ব্যক্তিশোকের একাকীত্ব থেকে । সুজাতা বোঝেন ব্রতী তাঁকে তাঁর নিঃসঙ্গ শোকের এককীত্বে রেখে চলে যায়নি। তাঁর মতো আরো বহুজনের সঙ্গে তাঁকেএক করে, আত্মীয় পাতিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সুজাতার আত্ম আবিষ্কারের প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত এত সরল থাকে না। মহাশ্বেতা ভোলেন না যে সুজাতারও আছে নিজস্ব সামাজিক প্রেক্ষাপট; তিনি 'ধনী', 'অভিজাত', 'অন্য শ্রেণীর মানুষ' তাই সমুর মায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ঘুচেও ঘোচে না। সুজাতা মনে মনে নিশ্চিত বোঝেন যে এখানে তাঁর আর আসা হবে না। 'প্রচণ্ড আঘাত, নিদাণ শোক, কাঁটাপুকুরে ও শ্মশানে তাঁদের দুজনকে এক করে দিয়েছিল বটে কিন্তু সে সাম্য চিরস্থায়ী হতে পারে না। সময় শোকের চেয়ে বলশালী।' তবু শেষ বিদায়ের মুহূর্তে সুজাতার ইচ্ছে হয় একটা দামী কিছু দিয়ে যান সমুর মাকে। তাই যে কথাটা কোনও দিন উচচারণ করতে পারেনা, সেই কথাটাই বলে যান 'যে দিন ওরা মারা যায়, তার পরদিন ব্রতীর জন্মদিন ছিল।'

ব্রতীর সহযাত্রী, বন্ধু ও প্রেমিকা নন্দিনীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে সুজাতার কাছে ধরা পড়ে অন্য এক বাস্তবতা। সেখানে শুধু ব্রতীকেই নয়, ব্রতীর মাকেও তিনি আবিষ্কার করেন ব্রতীরই চোখ দিয়ে। কিন্তু সেখানেও চলে ব্যর্থতাবোধের পরম্পরা --- নিজের সন্তানকে না চেনার, না চিনতে চাওয়ার গ্লানি। নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেসুজাতা মুখোমুখি হন আরো এক নিষ্ঠুর সত্যের। শুধু সুজাতারই জন্য, ব্রতী তার base-এ চলে যাওয়া সাংগঠনিক নির্দেশটা নিজের জন্মদিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল। 'তাহলে সুজাতার ক্ষুধিত, আঁকড়ে ধরা ভালবাসাও পরোক্ষ ব্রতীর মৃত্যুর জন্য দায়ী? তাঁর কষ্ট হবে বলে ব্রতী সেদিন কলকাতায় ছিল? নইলে ব্রতী চলে যেত বেসে? এক তীব্র অপরাধবোধ সুজাতার সমস্ত সত্তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যায়। নন্দিনীর কাছে সুজাতা শোনেন আন্দোলনের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা যা ব্রতীদের ঠেলে দিয়েছিল এক নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে, উপলব্ধি করে আপাত 'শান্তিকল্যান' -এর অন্তরালবর্তী ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পটভূমিটিকে। সুজাতার খুব ইচ্ছে করে নন্দিনীকে 'বুকে টেনে নিতে।...দোলা দিতে। ব্রতীকে যেমন করে বুকে টেনে নেননিতেমনি করে ওকে টেনে নিতে।' স্বাভাবিক, ক্ষুধিত, জীবন্ত এই ইচ্ছে মুহূর্তের জন্য সচেতন, শিক্ষিত, পরিশীলিত সুজাতার সঙ্গে সমুর মার সমস্ত ব্যবধান মুছে দেয়।শ্মশানে সমুর মাও কেবলই বলেছিল, 'আরে আমার বুকে আইনা দে। আরে বুকে নিলে আমি অহনই শান্ত অইমু। আর কান্দুম না।' নন্দিনী কিন্তু স্পষ্ট করেই বলে যে কলকাতায় থাকলেও তাদের আর কখনোই দেখা হবে না। সুজাতাও বোঝেন, নন্দিনী আর তাঁর জীবনের রেখা সমান্তরাল। মিলিত হন, এমন একটি বিন্দুও রেখাদুটির মধ্যে নেই। বিদায় নেওয়ার আগে সুজাতা নন্দিনীর হাতে তুলে দেন ব্রতীর একটি ছবি আর একই সঙ্গে অনুভব করেন প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

ব্রতী কেন 'হাজার চুরাশি' হয়ে গেল, সারাদিন ধরে তার টুকরো টুকরো ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে একসময় সুজাতা নিজেই বদলে যান। স্বামী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু, জামাতা পরিবৃতা এক প্রৌঢ়া সচেতনভাবে অস্বীকার করেন পারিবারিক মূল্যবোধকে। ব্রতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন অন্যদের থেকে। শুধু শাশুড়ি বা দিব্যনাথ নন, তাঁর অন্য তিন সন্তান যারা তাঁকে উপেক্ষা করেই বড় হয়েছে তারাও তাঁর মনে একসময় 'অন্য' দলে চলে যায় । ভেতরে ভতরে কষ্ট পেলেও দিব্যনাথের যেসব অন্যায় আচরণ তিনি এতদিন নীরবে সহ্য করে এসেছেন আজ তারই বিদ্ধে প্রতিবাদে সোচচার হয়ে ওঠেন। দিব্যনাথ তাঁর সারাদিনের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত চাইলে সরাসরি বলেন, 'দু' বছর আগে, বত্রিশ বছর ধরে তুমি কোথায় সন্ধ্যা কাটাতে, কাকে নিয়ে গত দশ বছর ট্যুরে যেতে, কেন তুমি তোমার এক্স - টাইপিস্টের বাড়িভাড়া দিতে তা আমি কোনোদিন জিগ্যেস করিনি। তুমি আমায় একটি কথাও জিগ্যেস করবে না। কোনোদিন না।' দৃঢ়ভাবে তুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করেন, '...আমি ব্রতীর কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করব না।' জেনে শুনে ব্রতীর মৃত্যুদিনে তুলির এনগেজমেন্ট -এর তারিখ ফেলার সিদ্ধান্তের পাশবিকতাও তুলে ধরেন অদ্ব্যর্থ ভাষায়। ব্রতীর চোখ দিয়ে দেখা পরিবার পরিজনদের নৈতিক অধঃপতন তাঁর কাছে সামাজিক মূল্যবোধ তথা আদর্শহীনতার সঙ্গে এক হয়ে যায়। ব্রতী মারা যাওয়ার পর দিব্যনাথের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, খবর গোপন করার জন্য অপরিসীম তৎপরতা, ব্যক্তিগত শোককে উপেক্ষা করে নিজের ও পরিবারের মান সম্মান তথা নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়াস, নিজেদের সুশৃঙ্খল জীবন বিপর্যস্ত হল বলে ব্রতীর প্রতি সকলের সম্মিলিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দোষারোপ এবং সর্বোপরি এক অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার অভিনয় সুজাতার চোখে সেই ভয়ঙ্কর পৈশাচিক সামাজিক নীরবতা তথা উপেক্ষারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। সুজাতা বোঝেন সমাজ, পরিবার কোথাও ব্রতীদের অ

াদর্শবাদের কোনও স্থান নেই আর হয়তো সেই জন্যই তাঁদের পালাবার ও জায়গা নেই--- একমাত্র মায়ের স্নেহ আর বিশ্বাস ছাড়া সর্বত্রই তারা ব্রাত্য। এই রাজনৈতিক চেতনা সুজাতাকে পারিবারিক আধিপত্য উপেক্ষা করার শক্তি জোগায়। এখন তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, 'যেখানে ব্রতী নেই সেখানে থাকবেন না।' কিন্তু ব্যক্তিগত, পারিবারিক অস্তিত্বের বদ্ধতা থেকে রাজনৈতিক মানুষে উত্তরণের এই পর্বেও বড় হয়ে ওঠে সুজাতার মাতৃপরিচয়।--- 'ব্রতী থাকতে যদি একদিনও এমনি করে মনের কথা দিব্যনাথকে বলতে পারতেন। বলে বেরিয়ে যেতে পারতেন ব্রতীকে নিয়ে! তাহলেও ফের াতে পারতেন না কিছুই হয়ত। শুধু ব্রতীর মনের কাছাকাছি হয়তো আসা যেত। ব্রতী জেনে যেত সুজাতাকে সে যা জেনেছে, তাই সব নয়। ব্রতী জেনে গেল না।' জ্ঞান হারাবার আগে সুজাতার শেষ আর্ত চিৎকার তাই 'রক্তের গন্ধ', 'প্রতিবাদ' আর 'শোক'-এর সঙ্গে মিশে থাকে এক অনপনেয় ব্যর্থতাবোধের হাহাকার। আর সেই হাহাকারে একটি র াজনৈতিক আন্দোলনের পরাভব, একটি প্রজন্মের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বেদনা, নিজের পরিজনদের চিনতে পারার গ্লানি এবং প্রিয়তম সন্তানকে সময় থাকতে চিনতে না পারার, বুঝতে না চাওয়ার ক্ষোভ এক অপরকে অনুরণিতকরতে করতে ছড়িয়ে যায় সমস্ত চরাচরে। কেঁপে ওঠে বিশ্বাসের ভিত, ভালবাসার ঘর আর প্রতিটি 'সুধী, সুখীঅস্তিত্বের মুখ'।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com